# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা


## রাজ্যের আর্থিক সংকট

# বামফ্রন্টের 'বিকল্প প্রস্তাবে' বিকল্প কোথায়

অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বিকল্প পথেই আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলা করার সাড়ম্বর ঘোষণা করে তাঁর সরকারের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি বই আকারে বের করেছেন। এবং বিকল্পনীতি থেকে একচুলও সরবেন না বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। অসীমবাবুরা অর্থসংকটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণনীতি এবং বিশ্বায়নকে দায়ী করে মুখে যত কথাই বলুন না কেন, বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে তাদের ঐকান্তিকতার যথেষ্টই অভাব দেখা যায়। এবং এটাও লক্ষণীয় যে, সি পি এম নেতৃত্ব উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের মৌখিক প্রতিবাদ করতে করতেই যে সমস্ত রাজ্যে তারা সরকার পরিচালনা করেন সেখানে সেগুলি কার্যকর করছেন।

"রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্কট ঃ কারণ ও সমাধানের পথ" শীর্ষক ডঃ অসীম দাশগুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা 'গণশক্তি'তে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়। সেখানে অর্থসঙ্কটের নানাবিধ কারণ নানাদিক থেকে ব্যাখ্যা করে ডঃ দাশগুপ্ত রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ সংক্রান্ত আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেছেন, "আগামী বছরগুলিতে আমরা প্রতিবছর কর-রাজস্ব ১৫ শতাংশ হারে এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ২০ শতাংশ হারে বাড়াতে চাইছি। বর্তমান বছরে ইতোমধ্যেই কর-রাজস্ব ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।" (গণশক্তি ৩১-১-০৩)। এর মধ্যে বিকল্প কোথায়? এতো শুধু কথারই বিকল্প। ১০ ফেব্রুয়ারি 'গণশক্তি' লিখেছে "(১) ভূমি রাজস্বের হার একর প্রতি ৭ টাকা থেকে ২০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, (২) জমির মালিকের নামান্তরকরণ অর্থাৎ জমি বেচাকেনায় এবং জমির প্রকৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ফি আরোপ করা হয়েছে, (৩) স্ট্যাম্প ডিউটি ও অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি হার ৮ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে, (৪) বেশি পরিমাণে মদের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতি সরলীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, (৫) ২০০২ সালের ২৩ আগস্ট থেকে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১ টাকা হারে এবং বাণিজ্যে অথবা শিল্পে ব্যবহৃত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) এর ওপর কিলোগ্রাম প্রতি ১ টাকা হারে সেস্ আরোপ করা হয়েছে, (৬) বাস, মিনিবাস, অটোরিক্সা ও ট্যাক্সি বাদে অন্যান্য

*চারের পাতায় দেখুন*

## বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা

# কমরেড স্ট্যালিন স্মরণে

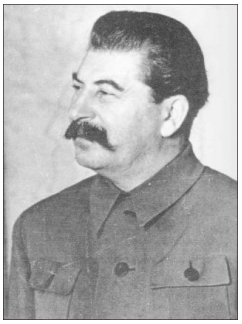

**"মতাদর্শের চর্চা করা পার্টির সর্বপ্রধান কর্তব্য। এর গুরুত্ব লঘু করে দেখলে পার্টি ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে ... সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব দুর্বল হলে, তার দ্বারা বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবকে শক্তিশালী করা হবে। ... বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ (vestiges) আজও আমাদের দেশে আছে। ব্যক্তি সম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নৈতিকবোধ ও মানসিকতার ধ্বংসাবশেষ (relics of private-property mentality and morality) আজও টিকে আছে। এটি কখনও আপনাআপনিই শেষ হয়ে যাবে না ; এগুলির টিকে থাকার ক্ষমতা খুব বেশি এবং এরা নিজেদের প্রভাব শক্তিশালী করতে পারে। তাই এগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। আবার, বাইরের পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং আমাদের দেশের ভিতরকার সোভিয়েট রাষ্ট্রবিরোধী গ্রুপগুলির অবশিষ্টাংশ — যা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়নি — এই উভয় শক্তি থেকে সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা, ভাবনা-ধারণা এবং মানসিকতা সোভিয়েট ইউনিয়নে অনুপ্রবেশ করবে না — এমন গ্যারান্টিও আমাদের কাছে নেই। একথাও ভুলে যাওয়া চলে না যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রুরা আমাদের সমাজের দুর্বল (unstable) মানুষদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চিন্তা প্রবেশ করাতে, সেগুলি উস্কে দিতে ও তাতে মদত দিয়ে বাড়িয়ে দিতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।**

**কিছু পার্টিসংগঠন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তাদের সকল দৃষ্টি আবদ্ধ করে ফেলছে, আদর্শগত সংগ্রাম ভুলে যাচ্ছে, তার চর্চা পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি মস্কো সংগঠনের মতো পার্টি সংগঠনেও মতাদর্শ চর্চার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে না। এই অবহেলা অবাধে চলতে দেওয়া যায় না। যখনই মতাদর্শ চর্চার শৈথিল্য ঘটছে, তখনই সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা ও ভাবধারার পুনরুত্থানের উর্বর জমি তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোন একটি জায়গাতেও যদি আদর্শগত চর্চার দিকটি কোন কারণে পার্টি সংগঠনের নজরের বাইরে থেকে যায় ; কোন একটা ক্ষেত্রেও যদি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রভাব দুর্বল হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রগুলিকেই — সমাজতন্ত্রের শত্রুরা, লেনিনবাদবিরোধী দুষ্টচক্রের অবশিষ্টাংশ, যারা এখনও রয়েছে, তারা দখল করবে এবং নিজেদের রাজনৈতিক লাইন চালু করার জন্য তা ব্যবহার করবে, সবরকম অমার্কসীয় 'চিন্তা' ও 'ধারণা' পুনরুজ্জীবিত করার ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাকে কাজে লাগাবে।"** (১৯ তম কংগ্রেসের রিপোর্ট)

## বাড়তি বিদ্যুৎ বিল বয়কট করুন

# ভোট আসতেই ত্রিশূল উঁচিয়েছে বিজেপি

ধিক্কৃত নিন্দিত গুজরাট লাইনই শেষ পর্যন্ত বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে চার রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে। মধ্যপ্রদেশে ভোজশালা-কামাল মৌলা মসজিদকে দ্বিতীয় বাবরি মসজিদ বানাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিন্দুত্বপন্থীরা। ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়েছে; বন্ধ কারফিউ পুলিশের গুলিতে মৃত্যু সংবাদের শিরোনামে এসেছে। ভোটের জন্য চলছে এই নোংরা খেলা। রাজস্থানে চলছে পাইকারি হারে ত্রিশূল বিতরণ। হিমাচল প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং গোহত্যা বন্ধের ও রামমন্দিরের দাবিতে উত্তেজনা উস্কে তুলছেন।

বাজপেয়িজির সর্বধর্মসমন্বয়ের মনমোহিনী বুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি-র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দাচার্য একবার বলেছিলেন — "বাজপেয়িজি আমাদের মুখোশ।" বাস্তবে বাজপেয়ি মুখ এবং মুখোশ দুইই। যতই তাঁরা আর এস এস বা বিশ্বহিন্দু পরিষদের দাঙ্গাবাজ চেহারা থেকে নিজেদের একটু আলাদা সমন্বয়বাদী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ভান করুন — সময় বুঝতেই সেই মুখোস খুলে ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্বের নখ দাঁত বের করতে তাঁরা দেরি করেন না। একের পর এক ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে এই 'সময়টা' আসে কোথাও একটা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে

*তিনের পাতায় দেখুন*

## কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

*এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক, কমরেড নীহার মুখার্জী গত ২১ ফেব্রুয়ারি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন —*

**আসন্ন নির্বাচনগুলিতে ফয়দা তোলার জন্য এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজেপি এবং সংঘপরিবার কুখ্যাত গুজরাট লাইনের অনুসরণে গোহত্যা, রামমন্দির ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাতে চাইছে। ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের এই মারাত্মক খেলায় আবার রক্তপাত, ধর্ষণ ও ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু হবে।**

**কংগ্রেস যথারীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামাবলীর আড়ালে একই রাজনীতির চর্চা করে যাচ্ছে। সি পি আই (এম)-এর নির্বাচন সর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনীতিও ফ্যাসিস্ট গৈরিকবাহিনীর এই মারাত্মক আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে না।**

**জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলকে একজোট করে জনগণের জ্বলন্ত সমস্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রামকে যুক্ত করে শক্তিশালী, সুসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গড়ে তোলাই এই মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন।**

## কমরেড স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

# সমাবেশ

**৫ মার্চ, বুধবার ● বিকাল ৪-৩০ মিঃ**

**রানি রাসমণি রোড, কলকাতা**

**বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ**

**সভাপতি ঃ কমরেড সনৎ দত্ত**

# পরিচারিকার রহস্যজনক মৃত্যু ● স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভ

গত ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কালিঘাটের বাসিন্দা প্রশান্ত দাস ও অঞ্জনা দাস তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে, ১১ বছরের বৃহস্পতি মণ্ডলের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার কৃপাখালির সূর্যকান্ত মণ্ডলের মেয়ে বৃহস্পতি দুবছর আগে ঐ বাড়িতে পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সম্প্রতি বৃহস্পতির দাদা বোনকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে বৃহস্পতির ওপর দাস পরিবারের অত্যাচার বেড়ে যায় এবং তারই পরিণতিতে এই মৃত্যু।

এই ঘটনা জানার সাথে সাথেই এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে স্থানীয় অধিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতিও প্রশান্ত দাস ও অঞ্জনা দাসের গ্রেপ্তারির দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখায়। ও-সি প্রথমে এফ-আই-আর নিতে চাননি, পরে আন্দোলনের চাপে তা নিতে বাধ্য হন এবং ঐ দাস পরিবারকে গ্রেপ্তার করেন।

# জলঙ্গিতে নির্মম অত্যাচারের শিকার মহিলার সাথে দেখা করল এম এস এস প্রতিনিধিদল

২৪ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার রওশন নগর গ্রামের গৃহবধূ খাজেমা বিবির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তাঁকে লাঠিপেটা, পায়ে পেরেক পোঁতা ও লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। ২৬ জানুয়ারি গ্রামীণ বিচারের নামে ঐ মহিলার চুল কেটে, মাথার ক্ষতস্থানে মোবিল ঢেলে, অভিযুক্ত যুবক সহ তাঁকে একটি সাইকেল টায়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে তিন কিলোমিটার পথ ঘোরানো হয়। মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে দেওয়া হয় এবং এগারো হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। সংবাদে প্রকাশ, এই বিচারসভায় নেতৃত্ব দেন সি পি এম, কংগ্রেস ও তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা প্রতিমা সিরাজের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত ১১ ফেব্রুয়ারি রওশন নগরে গিয়ে নির্যাতিতা খাজেমা বিবির সঙ্গে দেখা করেন। ঐদিনই জলঙ্গি থানার ওসি'কে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি অতিরিক্ত জেলা সুপার ও জেলা সভাধিপতিকে ডেপুটেশন দিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং ঐ মহিলার নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের দাবি জানান। বিক্ষোভ সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন কমরেড আসিয়া খাতুন, গুলশেনারা ইভা, সেলিনা খাতুন, পূর্ণিমা কর্মকার ও জেলা সম্পাদিকা প্রতিমা সিরাজ।

# চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজ বয়কট

রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ৪ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। অনেক আবেদন নিবেদন করেও কোন কাজ হয়নি। অগত্যা আন্দোলনে নেমেছেন কর্মচারীরা, চলছে কর্মবিরতি। এই কর্মচারীদের শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব, কিন্তু বাধ্য হয়েই তারা একাজ থেকে বিরত রাখছেন নিজেদের। চোখে আঙুল দিয়ে তারা দেখাতে চাইছেন তাদের বঞ্চনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কথা শোনার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড ভাস্কর ভদ্র পুরুলিয়া জেলা সমাহর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে মীমাংসায় বসার অনুরোধ জানিয়েছেন।

# বিদ্যুতের অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

শিল্পবিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ হর্সপাওয়ার পিছু ১২০০ টাকা হারে অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ চাপানোয় ছোট ছোট কারখানা, কুটির শিল্পগুলি বন্ধ হওয়ার মুখে। কৃষিক্ষেত্রে স্যালো গ্রাহকদের হর্স পাওয়ার প্রতি ৩৫০ টাকা, ডোমেস্টিক ও কমার্শিয়াল গ্রাহকদের উপর লোড অনুযায়ী ৩৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ চাপানো হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার এক মাসের মধ্যে এই চার্জ সম্পূর্ণ না মেটালে পর্ষদ লাইন কেটে দেবে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় শিল্প-গ্রাহকদের কাছ থেকে এই চার্জ আদায় শুরু হয়েছে। এতে তাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার টাকা সিকিউরিটি জমা রাখলেও তার কোন সুদ গ্রাহকদের দেওয়া হবেনা। পর্ষদের এই তুঘলকী কাণ্ডের প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি কাঁথি-সাতমাইল-মারিশদার শতাধিক শিল্পবিদ্যুৎ গ্রাহক বিদ্যুৎ পর্ষদের কাঁথি ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসে ডেপুটেশন দেন। প্রবল বিক্ষোভের চাপে একাউন্টস অফিসার কথা দেন, অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি জমা না দিলেও আপাতত লাইন কাটা হবে না। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য অশোকতরু প্রধান, কাঁথি শাখার হরেকৃষ্ণ দাস, জগন্নাথ দাস ও সুশান্ত জানা।

তমলুকের শিল্পবিদ্যুৎ গ্রাহকরা ১৩ ফেব্রুয়ারি রামসীতা বারোয়ারীতে এক কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুৎ পর্ষদের তমলুক সার্কেলের সুপারিনটেনডেণ্টের অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করেন, সিকিউরিটি চার্জ হিসাবে দু'মাসের বিদ্যুৎ বিলের সমান টাকা নিতে হবে এবং ঐ টাকার সুদ দিতে হবে। এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি, জেলা সম্পাদক মধুসূদন মান্না, মহাদেব সামন্ত, অশোকতরু প্রধান, কিশোর দে, সুব্রত হাজরা প্রমুখ।

# পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিবৃতি

## বি জে পি-র জমি করে দিচ্ছে সি পি এম

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন ঃ

"ধানতলার বীভৎস ঘটনায় নিজেদের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকা আড়াল করার জন্য সি পি এম বিপজ্জনকভাবে সমগ্র ঘটনার সাম্প্রদায়িকীকরণের ষড়যন্ত্র করছে। একইভাবে 'অনুপ্রবেশ' ও 'আই এস আই' ইস্যু নিয়েও রব তুলছে, যার উদ্দেশ্য রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যা থেকে অন্য দিকে জনগণের দৃষ্টি ঘোরানো, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে হিন্দু সেন্টিমেণ্টকে কাজে লাগানো এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক জাগিয়ে নিরাপত্তা দেওয়ার নামে তাদের ভোটে ব্যবহার করা।

লক্ষণীয়, উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি এজন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে খুবই প্রশংসা করছেন। কারণ এতে শেষ পর্যন্ত বিজেপি'র উত্থানের জমি তৈরি হচ্ছে।

আমরা সি পি এম নেতৃত্বের এই ভোটসর্বস্ব চরম সুবিধাবাদী রাজনীতি পরিত্যাগ করার এবং ধানতলার প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।"

## মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা

পুলিশ সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা করে এবং দুর্গাপুরে নারী ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন —

"ধানতলায় নারীধর্ষণ, খুন, ডাকাতির বীভৎস ঘটনায় রাজ্যবাসী যখন খুবই উদ্বিগ্ন, তখনি আবার দুর্গাপুরে রেডক্রশ হাসপাতালের বন্ধ্যাত্বকরণ ক্যাম্পে অর্ধচেতন ও অসহায় ৪ জন মহিলার শ্লীলতাহানির মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, অথচ মুখ্যমন্ত্রী আজই পুলিশ সমাবেশে পুনরায় সগর্বে দাবি করেছেন এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভাল। যেখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ অপরাধই সি পি এম আশ্রিত সমাজবিরোধীরা সংগঠিত করছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী চতুরতার সাথে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে দায়ী করে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সি পি এম ও পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব স্খালনের অপচেষ্টা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে অপরাধীদের আরও বেপরোয়া হতে এবং পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে উৎসাহ যোগাবে।

আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি এবং পুনরায় দাবি করছি —

১। দলীয় রং না দেখে সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

২। দলীয় কণ্ট্রোল মুক্ত রেখে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে।"

## পাইকারি বাজার ধর্মঘট

২৪ ঘণ্টার খাদ্য-শস্যের পাইকারি বাজার ধর্মঘট সমর্থন করে কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

"একদিকে রাজ্য সরকারের বাড়তি করের চাপ এবং অন্যদিকে এক শ্রেণীর সেলস ট্যাক্স অফিসার কর্তৃক আইন বহির্ভূত কর আদায়, ভয় দেখিয়ে ঘুষ চাওয়া, জোর জুলুম করা এবং অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার প্রতিবাদে ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, তা ন্যায়সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য।

অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনায় বসে অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা রাজ্য সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি।"

# নদীয়া বন্‌ধ সর্বাত্মক

## নদীয়া জেলা কমিটির বিবৃতি

১১ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই-এর ডাকা ১২ ঘণ্টার নদীয়া বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল হওয়ায় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "গত ৫ই ফেব্রুয়ারি ধানতলা থানার আইসমালিতে নারকীয় ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ধৃত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি ও নিহত বাসচালকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে আজকের বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সাথে সাথে দাবিগুলি পূরণ না হলে জনগণকে দুর্বার আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।"

## চটকল শ্রমিকদের প্রতি এস ইউ সি আই-এর আহ্বান

# কারখানায় কারখানায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন

বন্ধুগণ,

মালিকদের রক্তচক্ষু ও সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম, সমাজবিরোধীদের হুমকি এবং দালাল ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধতা — সবকিছু অগ্রাহ্য করে আপনারা যেভাবে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে ইউ টি ইউ সি (এল-এস) সহ ৫টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে গত ৭ই ফেব্রুয়ারি চটকল শিল্পে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছেন, তার জন্য আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনাদের বুঝতে হবে, চটকল শ্রমিকদের উপর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলছে, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, অন্যান্য শিল্পে ও অফিসে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপরও ভয়াবহ আক্রমণ চলছে। লকআউট, লে-অফ, ছাঁটাই, জোর করে অবসর করানো, বেসরকারীকরণ, মজুরি কমানো, বোনাস ও গ্র্যাচুইটি দেওয়া বন্ধ করা, কনট্রাক্ট প্রথা চালু করা, শ্রমিকদের অধিকার হরণ, আন্দোলনকারী শ্রমিকদের উপর পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের নৃশংস আক্রমণ ইত্যাদি গোটা দেশে বেড়েই চলেছে। হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, কোটি কোটি বেকার পথে পথে ধুঁকছে। গ্রামেও জমি নেই, কাজ নেই, চাষীরাও পথের ভিখারী হচ্ছে। অনেকে ক্ষিদের জ্বালায় আত্মহত্যা করছে। মালিকদের অত্যধিক মুনাফার স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি-বেঁচে থাকা সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, সকল সরকারী দল এই দেশী-বিদেশী মালিকদের টাকায় কেনা নোকর। এরাই মালিকদের লুণ্ঠনের স্বার্থে রাষ্ট্র-সরকার-আইন-পুলিশ-প্রশাসন সবকিছুকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, এ অবস্থায় শুধু কোন শিল্পের শ্রমিক আলাদা থেকে লড়াই করলে চলবে না। সকল শিল্পের শ্রমিককেই একে অপরের বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়ে মূল শত্রু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, পরস্পরকে আন্দোলনে সাহায্য করতে হবে।

আপনাদের রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে। জীবনের সবকিছু, দেশের সবকিছু চালায় রাজনীতিই, আন্দোলনকেও চালায় রাজনীতি। দেশ মালিক-শ্রমিকে, শোষক-শোষিতে শ্রেণী বিভক্ত। ফলে রাজনীতিও দুইধরনের — নাম ঝাণ্ডার যাই পার্থক্য থাকুক। একদিকে আছে মালিকদের দালালি করে, তাদের শোষণের শ্রেণীস্বার্থকে রক্ষা করে ভোটে মন্ত্রীত্বের চেয়ারে বসার রাজনীতি, অন্যদিকে আছে শ্রমিক ও শোষিত জনগণকে সংঘবদ্ধ করে লাগাতার লড়াই চালিয়ে মালিকি শোষণকে উচ্ছেদ করার রাজনীতি। আপনাদের এই দুই রাজনীতির চরিত্রের পার্থক্য বুঝতে হবে। বুঝতে হবে পুঁজিবাদী রাজনীতির দ্বারা শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালিত হলে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা হবে। এরা গরম গরম বুকনি দিয়ে, চোখের জল দেখিয়ে, লড়াইয়ের নামে রণং দেহি নাটকের শো করে বারবার আপনাদের ঠকাবে, আর শেষপর্যন্ত বেইমানি করবে। তাই আপনাদের শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব বিপ্লবী রাজনীতি বুঝতে হবে। বুঝতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে। আর লড়াইয়ের জন্য চাই উন্নত বলিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্র, যে হাজার অত্যাচার সত্ত্বেও মাথানিচু করবে না, ভয়ে পালাবে না, টাকার কাছে নিজেকে বিক্রী করবে না, যাই আক্রমণ আসুক ইজ্জৎ নিয়ে মাথা উঁচু করে বীরের মত লড়াই করবে। দাবি আদায় হোক আর না হোক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের মত লড়ে যাবে।

মনে রাখবেন, মালিক শ্রেণী ও সরকার শুধু লাঠি-গুলি ও জেল হাজত দিয়েই আন্দোলন ভাঙ্গে না, ওরা টাকা দিয়ে নেতাদের কিনে নেয়, ফলে সতর্ক থাকবেন। ওরা হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধিয়ে শ্রমিকের ঐক্য ভাঙে, ফলে এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন।

মনে রাখবেন, মালিক ও সরকার সহজে কোন দাবি মানবে না। ফলে নানারূপে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন কারখানায় কারখানায়, নানা বিভাগে, শ্রমিক বস্তিতে অসংখ্য সংগ্রাম কমিটি গঠন এবং সৎ ও সাহসীদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা। আপনাদের বাড়ির সন্তান এবং মহিলাদেরও এই আন্দোলনে সামিল করাবেন।

সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গেলে শেষপর্যন্ত আপনাদের জয় হবেই।

অভিনন্দন সহ

**প্রভাস ঘোষ**

*সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি*

**এস ইউ সি আই**

# কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ আবার খসে পড়ল

*একের পাতার পর*

এলে। তখনই তাঁরা গেরুয়াবাহিনী নামান। তারা ত্রিশূল উঁচিয়ে সংখ্যালঘুদের ভয় দেখায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ধোঁকা দেয়, কড়া ধর্মান্ধতায় মাতিয়ে বিচারবুদ্ধি অসাড় করে দেয়। এর আগেও গুজরাট গণহত্যার পর বিপন্ন মুসলিমদের সর্ববৃহৎ আশ্রয় শিবির শাহ আলম ক্যাম্পে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী; তার কদিন পরেই গোয়ায় বিজেপি'র কর্মসমিতির বৈঠকে বাজপেয়ি গণহত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মুখোস খুলে রেখে।

এখন বাজপেয়িজী নিজে রামমন্দিরের দাবিতে সোচ্চার শুধু নয়, আদালতের রায় মানবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সাথে তিনি এও বলে দিয়েছেন যে, কোর্টের রায় রামমন্দিরের পক্ষেই যাবে। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে এই উক্তি বাস্তবে আদালতের রায়কে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। রামমন্দির নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিশ্বহিন্দু পরিষদ দীর্ঘদিন ধরেই নিচ্ছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উস্কানি পেয়ে তারা সুর চড়াতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে এবারও ভোটের ঠিক আগেই বিজেপি উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারকেই মূল হাতিয়ার করেছে। সর্বধর্মসমভাব-এর ভণ্ডামি ছেড়ে তার আসল চেহারা বেরিয়ে এসেছে।

কিছুদিন আগে মোদি লাইন এবং গুজরাট গণহত্যা নিয়ে দেশবিদেশে প্রবল ধিক্কারের মুখে পড়ে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন 'হিন্দুত্ব' নয়, নির্বাচনে তাঁদের ইস্যু হবে 'উন্নয়ন'। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে তাঁরা উন্নয়নের প্রশ্ন ঘুণাক্ষরেও তুলছেন না। তাঁদের প্রচার দেখলে মনে হবে দারিদ্র্য, অনটন, অশিক্ষা, বেকারি, খরা, শৈত্যপ্রবাহে অসহায় মৃত্যু — এগুলো কোন সমস্যাই নয়, বাবরি মসজিদের জমিতে রামমন্দির হলেই হিন্দুদের মোক্ষলাভ হয়ে যাবে। আসলে বিজেপি নেতারা জানেন — খাদ্য, শিক্ষা, জীবন জীবিকা, ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ — এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তাদের জবাব দেওয়ার কিছু নেই। দেশে কোটি কোটি বেকার, কত কোটি তার সঠিক হিসাব কারো জানা নেই। শিল্পে মন্দা, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। চাষি ফসলের দাম পাচ্ছে না, বাজার নেই। মধ্যবিত্ত ক্রমশ ফকিরে পরিণত হচ্ছে। তার ওপর 'নীতিভিত্তিক রাজনীতির' বচনসর্বস্ব বিজেপি'র ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতি সীমাহীন। শিল্প কৃষি ধুঁকছে, অর্থলগ্নীর বাজারটা শাসকদলের মদতে লুঠের বাজারে পরিণত হয়েছে। বিজেপি তথা এন ডি এ-র মন্ত্রীদের অনেকেই যে সরকারের অভ্যন্তরে বড় বড় একচেটিয়া মালিকদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন — এও আজ আর অজানা নেই। রাজ্যে রাজ্যেও সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ। এই অবস্থায় খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরির প্রসঙ্গ উঠলেই বিপদ। কাজেই জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বিজেপি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলছে। এর ফলে মানুষের প্রাণ গেল কিনা, জীবনের শেষ সম্বলটুকু খোয়া গেল কিনা, নারীর ইজ্জত গেল কিনা — তার পরোয়া তাদের নেই।

বিজেপির এই ফ্যাসিস্ট চরিত্র নতুন নয়, কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ধবজাধারী কংগ্রেস কি করছে? সংবাদপত্রের ভাষায় বিজেপি'র গরম হিন্দুত্বের বিপরীতে তারা নরম হিন্দুত্বের লাইন নিয়েছে। কারণ নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে ভোট চাইবার মুখ তাদেরও নেই। বিজেপি এখন যে বিশ্বায়ন উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতি অনুসরণ করে মালিকশ্রেণীর মুনাফার কাছে জনস্বার্থকে বলি দিচ্ছে, সেই নীতির স্রষ্টা কংগ্রেস। বর্তমানে রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেসও মালিকদের স্বার্থই দেখছে। তাই তারাও 'হিন্দুত্বে' সুড়সুড়ি দিয়ে বিজেপি'র হিন্দু ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে চেষ্টা করছে। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ প্রচারে পাল্লা দিতে কংগ্রেস এতদূর নেমেছে যে 'অটলবিহারী গোমাংস খান' এমন ব্যক্তিগত প্রচার করতেও তাদের কুণ্ঠা হয়নি। উত্তরে অটলজি বলেছেন — "মরলেও তিনি গরু খাবেন না।" আসলে ধর্মান্ধ প্রচার ও পাল্টা প্রচারে তাঁরা দেশের মানুষকে গরু বানাতে চাইছেন। তাঁদের জেনে রাখা ভাল, মানুষ ঘাস খায় না, জীবনের বাস্তব সমস্যার আঘাত তাদের দেখিয়ে দেবে মন্দির-মসজিদ তাদের আসল সমস্যা নয়।

ভোজশালা সৌধে বসন্ত পঞ্চমীতে হিন্দুদের পূজা করতে দেওয়ার বিজেপি'র দাবির পাল্টা হিসাবে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং জানিয়েছেন, ভোজশালা সৌধে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বিভিন্ন দিন ও সময় ভাগ করে পূজা ও নমাজ পড়ার অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব তাঁরা আনছেন। যে ধর্মান্ধতার জন্য বিজেপি'র বিরোধিতা, সেই ধর্মান্ধতাকেই কংগ্রেস হাতিয়ার করছে। গুজরাটে প্রাক্তন আর এস এস নেতা শঙ্কর সিং বাঘেলাকে কংগ্রেসের মাথায় বসিয়ে একইভাবে ভোটের স্বার্থে হিন্দুত্বে সুড়সুড়ি দিয়েছিল কংগ্রেস। এবার চার রাজ্যেও তারা একই কৌশল নিচ্ছে। বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দলেরই একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জনবিরোধী রাজনীতিই তাদের এই নোংরা রাস্তায় টেনে এনেছে। রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনা আসলে আগুন নিয়ে খেলা, তা নরম গরম যাই হোক, তার বলি হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

এহেন কংগ্রেসকেই সামনে রেখে সি পি এম নেতৃত্ব সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প গড়ার জন্য আদা নুন খেয়ে লেগেছে। সোনিয়া গান্ধির রাজনৈতিক ভোজসভাতেও তারা যোগ দিয়েছে একই উদ্দেশ্যে। ত্রিপুরার নির্বাচনে কংগ্রেস বকলমে বিজয় রাংখালের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সি পি এম কিছুটা অসুবিধায় পড়লেও কংগ্রেসের পিছু তারা ছাড়েনি। বামপন্থা, গণআন্দোলনকে বিসর্জন দিয়ে যেকোন প্রকারে গদি দখলের

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

# জলকর ঃ সরকারের টাকা নেই জনগণের কী অঢেল টাকা ?

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার গড়ফায় পানীয় জলের বুষ্টার স্টেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে, তৃণমূল নেতা, মেয়র সুব্রত মুখার্জীকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের জনগণের উদ্দেশ্যে বাণী দিয়েছেন, "অনেকের ধারণা, ঈশ্বর জল দেন। এ ধারণা ঠিক নয়, জল ঈশ্বর দেন না।"

একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রথম প্রয়োজন জলের। তাই জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু সব জলই পানীয় জল নয়। আধুনিক জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলে জলকে পরিশ্রুত করে সরবরাহ করতে হয়। এই পরিশ্রুত পানীয় জল দেশের মানুষকে সরবরাহ করা যেকোন সরকারের একটি ন্যূনতম দায়িত্ব। আমাদের দেশেও দীর্ঘদিন ধরেই সব সরকারকেই অল্পবিস্তর এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সে দায়িত্ব পালনে অনেক ত্রুটি থাকলেও অতীতে বিশেষ করে পানীয় জলের জন্য আলাদা করে ট্যাক্স দেওয়ার দাবি কোন সরকারই করতে পারেনি। গোটা বিশ্বজুড়ে আজ যখন বিশ্বায়নের নামে পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়ে সেগুলি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে তখন আমাদের রাজ্যেও বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আরও উন্নত বামফ্রন্টের গাওনা গাইতে গাইতে পানীয় জলের জন্য টাকা চাইছেন। বলছেন, সরকারের টাকা নেই। জলকে পরিশ্রুত করে সরবরাহ করার জন্য সরকার আর ভরতুকি দিতে পারবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির মতো বামফ্রন্ট সরকারও সাধারণ মানুষের ওপর একের পর এক নতুন ট্যাক্স বসাচ্ছে, তাহলে আবার নতুন করে জলের জন্য ট্যাক্স কেন? এমনিতেই গোটা দেশজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মেই যে মন্দা চলছে তার দায় বহন করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে বেতন-মজুরির হ্রাস ঘটছে, প্রতিদিন কলকারখানা বন্ধ হয়ে, ছাঁটাই হয়ে, বাধ্যতামূলক অবসরের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারাচ্ছে, বেকার যুবক-যুবতীরা সম্মানজনক কাজের ন্যূনতম সুযোগও পাচ্ছে না। এই অসংখ্য সমস্যাজর্জরিত মানুষ যারা ভেবেই পাচ্ছে না কীভাবে দিন গুজরান হবে, তাদের ওপরেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্রমাগত একের পর এক নতুন ট্যাক্সের বোঝা। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সরকারের কোষাগারে টাকা না থাকে তবে জনসাধারণের পকেটে টাকা থাকবে কী করে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভেবে দেখেছেন কি?

যে নেতা-মন্ত্রীরা অহরহ বাণী শোনাচ্ছেন, বিনা পয়সায় কিছুই দেওয়া যাবে না, জল খেতে হলেও পয়সা দিতে হবে প্রভৃতি — তাদের বিলাসব্যসন, দুর্নীতি, অপব্যয়, রাজকীয় চালচলন সমস্ত কিছুই আসছে দেশের বেশিরভাগ দরিদ্র জনসাধারণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকা থেকে। এক্ষেত্রে তাঁরা একবারও বলেন না যে, দেশের যে মানুষকে ন্যূনতম পানীয় জলটুকু দিতে পারছি না, তাদের ট্যাক্সের টাকায় নবাবি করব না। তা যেমন তাঁরা বলছেন না, তেমনি এই টাকা থেকেই তাঁরা দেশের পুঁজিপতিদের বিপুল পরিমাণ ছাড় দিচ্ছেন। নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি দেওয়া হচ্ছে, জল দেওয়া হচ্ছে, বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, শত শত কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হচ্ছে — তাতে টাকার অভাব হয় না। টাকার অভাব শুধু সাধারণ মানুষের জন্য ন্যূনতম পরিষেবা দিতে। অথচ একটা বামপন্থী তো দূরের কথা, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতি মেনে চলা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব সকল মানুষের কাজের ব্যবস্থা করা। বেঁচে থাকার মতো খাদ্যের ব্যবস্থা করা, না হলে কী প্রয়োজন সেই সরকারের? আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিদেশি শাসকদের হঠানোর পাশাপাশি খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কাজের দাবিই ছিল প্রধান। পরাধীন ভারতে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার মেয়র হয়ে অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছিলেন প্রতিটি মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলনে কাজের দাবি, খাদ্যের দাবিতে মহানগরীর রাজপথ বার বার উত্তাল হয়ে উঠেছে। এমনকি এই বামফ্রন্টেরই অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ১৯৮৫ সালে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জোরের সাথে বলেছিলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মেনে জলকর আমরা বসাবো না। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দূরদর্শন আয়োজিত 'যুক্তিতক্কো' অনুষ্ঠানে পুরমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি কোন উত্তর দেননি। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই বামফ্রন্ট সরকার যেমন জনগণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, রাজ্যের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, জলকরের ক্ষেত্রেও আজ একই জিনিস ঘটছে।

ক্ষমতায় দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে কায়েমী স্বার্থের সাথে তাদের যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে তার ফলেই সাধারণ মানুষের স্বার্থকে আজ তার প্রতি পদে মালিক-স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতাই তো শেষ কথা নয়। তাই, ২৭ জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে এবং মানুষের সক্রিয় প্রতিবাদ লক্ষ্য করে অন্যান্য বিষয়ের মতো জলকর চালুর বিষয়েও তারা পিছু হঠতে শুরু করেছে। বস্তি অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই কর পুরোপুরি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে এই কর ৩০ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা লাগবে বলে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি মানুষের বিচারবুদ্ধি ঘুলিয়ে দেওয়ার জন্য তারা বলছেন, জল ঈশ্বর দেননা, সরকার দেয়। অর্থাৎ, পয়সা খরচ করেই সরকারকে জল সরবরাহ করতে হয় এবং সেই জল নাগরিকদের পয়সা দিয়েই কিনতে হবে। তাহলে সরকার ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও 'উন্নত বামফ্রন্ট' সরকারের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়?

# বিকল্প প্রস্তাবে বিকল্প কোথায় ?

*একের পাতার পর*

প্রতিটি মোটরযানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করের পরিমাণ ১০০০ টাকা হারে বৃদ্ধি করার জন্য একটি বিল বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনে অনুমোদিত হয়েছে, (৭) ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি, সাময়িক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও পুনর্নবীকরণ ফি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, (৮) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পরিষেবার ক্ষেত্রে ফি/চার্জের হারও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির মধ্যে আছে, অগ্নিকাণ্ড নিরাপত্তা বিষয়ে পরিষেবার ফি, সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন পরিষেবার জন্য দেয় মূল্য, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী ও মেডিক্যাল শিক্ষার ফি, বিদ্যুতের পরিষেবার ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি এবং পরীক্ষা ও পরিদর্শকের ফি সমূহ, প্রাণীসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ও উপস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিষেবার মূল্য, বনজ সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফি, সরকারি আবাসনের ভাড়া, সরকারি আবাসনের এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে থাকার জন্য দেয় অর্থ। এছাড়া পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার চালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় হয় তার আংশিক সংস্থানের উদ্দেশ্যে জলকর চালু করার বিষয়টির ওপর সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।"

রাজ্য সরকারের বিকল্প পদক্ষেপগুলির যতটুকু এখানে ওদের ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো তা এককথায় জনগণের উপর আক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যান্য রাজ্যে অবামপন্থী সরকারগুলিও এই কাজটাই করছে। তাহলে রাজ্য সরকার কি বিকল্পের ডামাডোলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসরণে কর-দর-মূল্যবৃদ্ধি, বেসরকারীকরণের নীতি নিয়েই চলছে না? তাই যদি হয় তাহলে 'বিকল্প বিকল্প' বলে এত প্রচার করার কী আছে?

এর কারণ খুবই স্পষ্ট। বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে 'উন্নততর বামফ্রন্ট' উন্নত কায়দায় পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় অটল থাকার লাইন অনুসরণ করছে। আর যত বেশি করে পুঁজিপতি ঘেঁষা নীতি নিয়ে শাসক সি পি এমের অগ্রযাত্রা, তত বেশি করেই কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, শরিক দলগুলোও প্রশ্ন তুলছে, তাহলে এই বামফ্রন্টের প্রয়োজন কি? এই সমস্ত প্রশ্ন চাপা দিতেই তাঁরা অন্তত কথার ফুলঝুরিতেই দেখাতে চাইছেন তাঁদের অনুসৃত পথ বিকল্প, আলাদা, অবামপন্থী সরকারগুলি থেকে পৃথক। কিন্তু মুখে তারা যাই বলুন ভুক্তভোগী মানুষ বামফ্রন্টের এই আর্থিক সংস্কারের স্টীমরোলারে জেরবার হতে চলেছেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সাধারণ মানুষ যাতে সরকারের এই চালাকি ধরতে না পারে সেজন্য নানা কথার চাতুরির আশ্রয় তাদের নিতে হচ্ছে।

কিন্তু 'বিকল্প' লেবেলের অন্তরালে যে জনবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বাস্তবের নির্মম আঘাতে সকলেই অচিরে তা বুঝবেন। বাঁচার সংগ্রাম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তাই লড়াইয়ের ময়দানে তারা এগিয়ে আসবেন — এও এক অনিবার্য সত্য।

# ইরাকের ওপর সম্ভাব্য মার্কিন হামলার প্রতিবাদে জামশেদপুরে পথসভা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জামশেদপুরের সাকচী গোলচক্করে ইরাকের ওপর সম্ভাব্য মার্কিন হামলার প্রতিবাদে এক পথসভা হয়। সভাশেষে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। পথসভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস ইউ সি আই-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিজন দাস বলেন — "সমাজবাদী শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমেরিকা আজ সারা বিশ্বে মাতবরি করে বেড়াচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে বিভিন্ন দেশের ওপর হামলা চালাচ্ছে। ইরাকের তৈল ভাণ্ডারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আবার অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী জনতা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে। খোদ আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ মিছিল করছেন। আমরাও এই সম্ভাব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

# খিদিরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর খিদিরপুর - মোমিনপুর আঞ্চলিক কমিটির ডাকে ইরাকের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার প্রবীন কমরেড মুরশেদ আলী। খিদিরপুরে আমজু সারেং মোড়ের এই সভায় বহু সাধারণ মানুষ গভীর মনোযোগের সাথে বক্তাদের আলোচনা শোনেন। কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তা ছিলেন কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত। খিদিরপুর আঞ্চলিক কমিটির অন্যতম নেতা কমরেড জাহেদ আখতারও সভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই এদেশে যে যথার্থ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলছে, তাকে সমর্থন ও শক্তিশালী করার আহবান জানান।

সভার শেষে উপস্থিত সহস্রাধিক মানুষ "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক", "বুশ ব্লেয়ার আঁতাত ধ্বংস হোক", 'ইরাকের ওপর আক্রমণ করা চলবে না" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

# রাজপথে নতুন সুপারপাওয়ার
## চ্যালেঞ্জের মুখে আমেরিকা

ইরাক প্রশ্নে পশ্চিমী জোটে ভাঙন ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিরোধী গণবিক্ষোভ স্মরণ করিয়ে দিল যে, বিশ্বে এখন একটি নয়, দুটি সুপার পাওয়ার রয়েছে — একটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অপরটি বিশ্বজনমত, যার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে দেশে দেশে রাজপথে।

'ইরাককে নিরস্ত্র করবই, সেজন্য যুদ্ধে যেতেও পিছপা নই' — এই হুংকার তুঙ্গে তুলে এখন বুশ দেখছেন, তার চোখে চোখ রেখে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে — সাদ্দাম হুসেন নয়, খোদ আমেরিকার জনগণ। একদিনের জন্য একটা বিক্ষোভে জড়ো হয়ে এই জনতা আবার হারিয়ে যাচ্ছে তা নয়। এক অসামান্য দৃঢ়তা নিয়ে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন সেখানে লাগাতার চলছে এবং ক্রমেই তা শক্তিশালী হচ্ছে। এরা যুদ্ধের বিভীষিকায় জনগণকে সন্ত্রস্ত করছে না, নিছক শান্তির বাণী আওড়াচ্ছে না, এই আন্দোলন প্রশ্ন তুলছে, জবাব চাইছে এবং অনেকে একথাও ঘোষণা করেছে যে, জনমতকে অবজ্ঞা করে শাসকরা যদি যুদ্ধে যায়, তবে জনগণ নীরবে তা মেনে নেবে না, আন্দোলন অহিংস থাকবে না।

১৫ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে ১০ লক্ষ মানুষের যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের উদ্যোক্তা ছিল 'স্টপ দি ওয়ার কোয়ালিশন' নামে নানা সংগঠনের একটি মোর্চা। এরা বলেছে "১৫ ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ মিছিল আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই সংগঠিত করতে চেয়েছি, এবং সেটাই হয়েছে। কিন্তু সরকার যদি এই জনমতকে উপেক্ষা করে, তবে আমরা নিশ্চিত যে, যুদ্ধ শুরু হলেই অশান্তি ঘটবে। যেদিন যুদ্ধ শুরু হবে, সেদিনই ব্রিটেনের জনগণের রোষ ও ক্ষোভ ফেটে পড়বে। একে উপেক্ষা করলে, টনি ব্লেয়ার নিজের ধ্বংসই ডেকে আনবেন।" এই মোর্চার পক্ষ থেকে ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আহবান জানানো হয়েছে যাতে যুদ্ধ শুরু হলেই শিল্প শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমে যায়। এটা শুধু ব্রিটেনের চিত্রই নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশ তো বটেই, খোদ আমেরিকার বুকেই আজ জনগণের এই মেজাজ।

এরা প্রশ্ন তুলেছে ঃ ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য এত তাড়াহুড়ো কেন? ইরাকের 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র' থাকলে তা ধ্বংস করাই যদি মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকদের লক্ষ্য হয়, তবে সেই অস্ত্র খুঁজে বের করার জন্য, অথবা তা সত্যই আছে কিনা, তার অনুসন্ধান চালাবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের অস্ত্রপরীক্ষক দলকে সময় দিতে কেন এত আপত্তি? প্রশ্ন যত উঠছে, ততই সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, মার্কিন শাসকরা যুদ্ধের হুংকার বাড়াচ্ছে। এ ঘটনাই প্রমাণ করে, বুশ ব্লেয়ার এ্যাণ্ড কোম্পানির অন্য মতলব রয়েছে। কী সেই মতলব?

প্রেসিডেন্ট বুশ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির চোখ আটকে আছে ইরাকের তেলে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, এরা দুজনই কেবল নয়, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কাণ্ডোলিজা রাইস ও জর্জ বুশের উপদেষ্টা কার্ল রোভ, বুশ প্রশাসনের এই চারজন কর্তাই হোয়াইট হাউসের চেয়ার পাওয়ার আগে আমেরিকার পেট্রলিয়াম শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। এদের মতলব এত স্পষ্ট ও এতটাই নগ্ন যে মার্কিন জনগণের দৃষ্টি সেখান থেকে ঘোরাতে হলে 'সন্ত্রাসবাদ' ও 'নিরাপত্তার' ধূয়া তোলা ছাড়া উপায় নেই। একজন মার্কিন সাংবাদিক লিখেছেন, 'জনগণ যদি ধরে ফেলে যুদ্ধ হচ্ছে কিছু মার্কিন পেট্রলিয়াম কোম্পানির বাড়তি পকেট ভরাবার স্বার্থে, তবে কেন নাগরিকরা তাঁদের

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

**২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ঃ উত্তর ইটালির মনসেলিস স্টেশনে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারীরা মার্কিন অস্ত্র বোঝাই ট্রেন অবরোধ করছেন।**

**২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ঃ মার্কিনী রাইন-মেন বিমানঘাঁটি অবরোধকারী ৩০০০ মানুষের হাতে পোস্টার ঃ "বুশকে নিরস্ত্র কর"।**

**ব্রিটেন**

## ইরাকগামী অস্ত্রবাহী জাহাজ আটকে দিল যুদ্ধবিরোধীরা

সম্প্রতি ব্রিটেনের সাউদাম্পটনের নৌবন্দর মার্চ উড থেকে রাজকীয় নৌবাহিনীর পণ্যবাহী জাহাজ 'ডার্টি ফোর'-এর ভারী কামান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ইরাক যাত্রা করার কথা ছিল। যাত্রার দিন ঠিক ছিল ২৫ জানুয়ারি। আগের দিন অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারির রাত থেকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন 'গ্রীন পিস'-এর ব্রিটিশ শাখার সদস্যরা 'রেনবো ওয়ারিয়ার' নামক সংগঠনের জাহাজ থেকে হাওয়ায় ভরা ছোটো ছোটো নৌকো দিয়ে 'ডার্টি ফোর'-এর যাত্রাপথ আটকে দেয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডের একটি বন্দরে ফরাসী গোয়েন্দারা 'রেনবো ওয়ারিয়র'কে জলে ডুবিয়ে দিলে একজন নাবিকের সলিল সমাধি ঘটে। যাই হোক, ৪৮ ঘণ্টা আটক থাকার পর নৌবাহিনীর পুলিশ এসে অবরোধকারীদের মারধর করে সরিয়ে দেবার পরই 'ডার্টি ফোর' তার গন্তব্যস্থল অভিমুখে যাত্রা করতে পারে।

(সংবাদসূত্র ঃ প্রলেতারিয়ান নিউজ, ২৭.১.২০০৩)

# নোবেলজয়ীদের প্রতিবাদ

মার্কিন শাসকদের ইরাক যুদ্ধের হুংকার ও প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সে দেশের ইতিহাসবিদদের পরসোচ্চার হয়েছেন এবার ৪০ জন নোবেল পুরস্কার প্রাপক। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, অর্থনীতি বা শান্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে এঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে যেমন একদিকে রয়েছেন হরগোবিন্দ খোরানা, আহমেদ এইচ জেওয়েল, ফেরিদ মুরাদে'র মত বিজ্ঞানী, অন্যদিকে ওয়াল্টার কন, জর্জ এ একারলফ, রবার্ট ডব্লু উইলসনের মত বিজ্ঞানী বা লেখকরা, এঁরা অনেকেই আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞানপদকপ্রাপ্ত। তাছাড়া হান্স এ বেথে ম্যানহাটান প্রজেক্টের ডিরেক্টর ছিলেন, চার্লস টাউনেস ছিলেন প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর। অর্থাৎ সেদেশের বিজ্ঞান এমন কি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার প্রথম সারির মানুষরাও আজ আর বুশের রণহুংকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দ্বিধা করছেন না। এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত স্বাক্ষর সম্বলিত এক ঘোষণায় এঁরা জানিয়েছেন — "ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে হয়ত সত্যসত্যই খুব দ্রুত জয় আসতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ মানেই হল মানুষের জীবননাশ ও বহু অনাকাঙ্খিত ঘটনা। আমরা মনে করি, ইরাকের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক আক্রমণে জয় এলেও এই যুদ্ধের ফলে চিকিৎসাক্ষেত্র, অর্থনীতি, পরিবেশ, রাজনীতি, আইন, ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা আমেরিকার নিরাপত্তাকে রক্ষা করার বদলে বিঘ্নিত করবে এবং বিশ্বে আমেরিকার ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" একই সাথে ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র মতামত ব্যক্ত করে নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের সমর্থন জানিয়েছেন ফিজিসিয়ানস্ ফর সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি সংক্ষেপে পি এস আর (সামাজিক দায়িত্বপালনে ব্রতী চিকিৎসক)। ১৯৮০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিল আণবিক যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসক নামক এক সংস্থা ( আই পি পি এন ডব্লু)। পি এস আর এই সংস্থারই মার্কিন সহায়ক শাখা। এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা দেখিয়েছে যে শতকরা সত্তর ভাগ মার্কিন জনগণ মনে করে যে, ইরাকে নিযুক্ত অস্ত্রপরীক্ষকদের কাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়া উচিত আমেরিকার। পি এস আর মার্কিন জনগণের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামতের সঙ্গে একমত।'

বিশ্বের দিকে দিকে যে জনমত আজ বুশ-ব্লেয়ার আঁতাতের নির্লজ্জ ও উন্মত্ত যুদ্ধলিপ্সার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, এমন কি মার্কিন মুলুকেও যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসছে, নোবেল পুরস্কার প্রাপক ও অন্যান্যদের এই ইরাক যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নিঃসন্দেহে যুদ্ধ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চার করবে।

**ইরাক অভিযান ঠেকাতে**

## মার্কিন সেনারা আদালতের দ্বারস্থ

একজন মেরিন সেনা সহ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন একদল মার্কিন সেনা, তাদের পরিবারবর্গ এবং মার্কিন কংগ্রেসের ছয় সদস্য মিলে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সম্ভাব্য ইরাক আক্রমণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বোস্টন জেলা আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এ মামলার অ্যাডভোকেট জন সি বনিফেজ বলেন, "প্রেসিডেন্ট তো আর রাজা নন, মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া প্রেসিডেন্ট একক সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারেন না।" এ মামলায় প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও প্রতিরক্ষা সচিব এইচ রামসফেল্ডকে বিবাদী করে সম্ভাব্য ইরাক আক্রমণের উপর ইনজাংশান দেওয়ার জন্য বাদী পক্ষ থেকে জেলা আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে। (সংবাদসূত্র ঃ দি হিন্দু ও ডেকান হেরাল্ড ১৬.২.২০০৩)

# জর্জ বুশ ঠিক এখনই এত মরিয়া কেন ?

*পাঁচের পাতার পর*

সন্তানদের যুদ্ধে প্রাণ দিতে পাঠাবেন ?" ফলে জনগণকে ভোলাবার জন্যই মিথ্যাপ্রচার চালানো হচ্ছে রকমারি উপায়ে।

ইরাকে রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলভাণ্ডার। বুশের চোখে সাদ্দামের সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে, তিনি রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইটালির তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছেন। সাদ্দাম ক্ষমতায় থাকলে বুশ ও ব্লেয়ারকে দেখতে হবে যে, ইরাকের তেল তোলার চুক্তি পেয়ে অন্যান্য দেশের কোম্পানিগুলো বিপুল মুনাফা করছে এবং সেখানে ঢুকতে পারছে না মার্কিন-ব্রিটিশ কোম্পানি। এইসব কোম্পানির মালিকরা, যাদের সাথে প্রেসিডেন্ট বুশ টেকসাসে গলফ্ খেলেন, তারা কী প্রেসিডেন্টকে ছেড়ে দেবে? ইরাকে 'শাসক পরিবর্তন' করার যে আওয়াজ তোলা হয়েছে, তার অর্থ যেমন সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করা, তেমনই তেল নিয়ে যেসব চুক্তি সাদ্দাম শাসনে হয়েছে, সেগুলি বাতিল করা, নতুন আলোচনার দ্বারা নতুন চুক্তি করা। সাদ্দামকে সরিয়ে আমেরিকা যদি একটা পুতুল সরকার বাগদাদে বসাতে পারে তবে তেল তোলার সিংহভাগ চুক্তি যে মার্কিন কোম্পানিগুলি পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য, ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ার যেভাবে বুশকে টানা সমর্থন দিয়ে গেছে, তাতে কিছু কনট্রাক্ট ব্রিটিশ কোম্পানিও পেতে পারে।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নজর কেবল ইরাকের তেলের উপরই নয়, অন্য সম্পদও ইরাকের রয়েছে। সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে জল। ইরাকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এই জল। ইরাকের দুই নদী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস জল সরবরাহ করে আরব ভূখণ্ড, দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া, সৌদি আরব, সিরিয়া, জর্ডন এমনকি ইসরায়েলকেও। ইয়েমেন, ওমান ও ইরান —সকলেরই এই জল দরকার। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের দিক থেকে এই অঞ্চলে জলের গুরুত্ব তেলের চেয়েও বেশি।

ইরাকের উপর যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, মধ্য এশিয়ার ভবিষ্যৎ থাকবে তার কবজায়। তাছাড়া মূল্যবান নানা সম্পদ যখন ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বেই, তখন যুদ্ধের খেলায় লক্ষ্য কেবল পশ্চিম এশিয়া নয়। জর্জ বুশ এ্যাণ্ড কোম্পানি সারা দুনিয়াকে দেখাতে চায় যে, তাদের আধিপত্যের পিছনে রয়েছে নৌবহরের শক্তি। তারা চায় বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র যেন একথা না ভোলে যে, গানবোট ডিপ্লোম্যাসি বা যুদ্ধের হুমকির সামনে একটা দেশকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার কৌশলে আমেরিকা সকলের উপরে রয়েছে। কারণ, তার যুদ্ধ জাহাজও যেমন অঢেল, তেমনই সেগুলি ব্যবহার করে মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতেও মার্কিন শাসকরা দ্বিধা করেনা। অতএব, বুশের হুকুম — দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রকে আমেরিকার বশ্যতা মেনে নিতে হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর গোটা দুনিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্বই কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে নতুন করে এই হুমকির প্রয়োজন এখনই দেখা দিল কেন? কেনই বা বেছে নেওয়া হল ইরাককে?

জর্জ বুশের পরামর্শদাতারা বিলক্ষণ জানে, আমেরিকার অর্থনীতির দশা এতই শোচনীয় যে, 'যেকোন সময় অর্থনীতিতে ধস নামতে পারে' এমন কথাবার্তা এখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। ছাঁটাই বাড়ছে, শেয়ারের দাম কমছে, সামাজিক পরিষেবার দায়িত্ব সরকার ঝেড়ে ফেলছে, পেনশনের সুযোগ চলে যাচ্ছে। মার্কিন জনজীবনে শান্তি ও সুস্থিতি নেই, সর্বত্র দুশ্চিন্তার ছায়া। জনগণের এই ক্ষোভ থেকে রাষ্ট্রপতি রেহাই পেতে পারেন না, এটা পরামর্শদাতারা ভালই বোঝেন। নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা দিতে প্রেসিডেন্টের এই ব্যর্থতা থেকে মানুষের চোখ অন্যত্র, দেশের বাইরে ঘুরিয়ে দিতে যুদ্ধের চেয়ে বড় উপায় আর কী আছে! যুদ্ধ শুরু করলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিমান হানায় বোমা-আগুন-ধোঁয়া ও ধ্বংসের ছবি ২৪ ঘণ্টা টি-ভি'র পর্দায় দেখানো হবে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হবে যুদ্ধের রঙিন ছবি, বর্ণনা করা হবে রোমহর্ষক কাহিনী। অবশ্যই ভেতরের পাতায় চলে যাবে অর্থনীতির ভগ্নদশার সংবাদ, ছাঁটাই ও মন্দার রিপোর্ট। যুদ্ধজয়ের হুল্লোড়ে মানুষ ভুলে থাকবে আর্থিক দুর্গতির কথা।

ভোটের সময় বুশ নাগরিকদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা একটিও রাখেন নি। জনমত সমীক্ষায় তার প্রতি সমর্থনের রেখা ক্রমাগত নামছে। সমর্থন বাড়াতে হলে তুলে ধরতে হবে বুশকে দেশপ্রেমের প্রতীক রূপে, আর দেশের মানুষকে বেহুঁশ করে দিতে হবে দেশপ্রেমের মাদকে। একাজে সফল হলে তার জের আগামী ভোট পর্যন্ত টেনে নেওয়া যাবে বলেই আশা বুশের উপদেষ্টাদের।

সুতরাং, একথা পরিষ্কার যে, ইরাকে মার্কিন হামলার পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থ, এবং 'বৃহৎ পুঁজিপতিদের এজেন্ট হয়ে যেসব রাজনীতিকরা শাসকদের চেয়ারে বসে আছে, আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত জনগণের রোষের আগুন থেকে তাদের নিজেদের গদি বাঁচাবার স্বার্থ। এই ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর অতি ক্ষুদ্র ও নীচ স্বার্থ রক্ষার জন্যই রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হবে আরব ভূখণ্ডে। তাছাড়া যুদ্ধ চাই অর্থনীতির সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে যতদূর সম্ভব বাজারে তেজীভাব বজায় রাখার জন্য, তৈরি অস্ত্র ক্রমাগত খালাস করার জন্য। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বাঁচতে পারেনা।

সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে এই যুদ্ধে বিশ্বের জনগণ ধর্মের ভেদে দু'ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের এই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী জনতার সমুদ্রে ধর্মের কোনও ভেদরেখা দেখা যাচ্ছে না, সম্মিলিত জনকণ্ঠে গর্জন উঠছে — "এই অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ কর।"

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছিল, সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন নেই, তখন বিশ্ব তার হাতের মুঠোয়। বিশ্বায়ন ও ডব্লু টি ও'র মধ্য দিয়ে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা তারা খাড়া করে ফেলেছে বলে ধরে নিয়েছিল যেখানে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত আর দেখা দেবেনা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইউরোপ মাথা তোলার সাহস পাবে না। কিন্তু অর্থনীতি-রাজনীতি শাসকদের ইচ্ছানুযায়ী চলে না, তার নিজস্ব নিয়ম আছে। এই নিয়মেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিজেই তার সঙ্কট তৈরি করে, এই নিয়মেই বাজার ও মুনাফা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়। এই নিয়মেই সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে যেতে হয়, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদীরা আরও ভেবেছিল ও বলেছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের ফলে ইতিহাস শেষ হয়ে গেল, দুনিয়ায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদই শেষ কথা। বর্তমান দুনিয়াজোড়া যুদ্ধবিরোধী উত্তাল জনবিক্ষোভ দেখিয়ে দিচ্ছে ইতিহাস শেষ হয়নি। দুনিয়ার মেহনতী জনগণ আবার নতুন ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছে। কাঁপন ধরিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শিবিরে।

(তথ্যসূত্র ঃ দি টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস্, দি স্টেটসম্যান)

# ত্রিশূল উঁচিয়েছে বিজেপি

*তিনের পাতার পর*

রাজনীতি তাদের এখন বৃহৎ বুর্জোয়া দলের লেজুড়ে পরিণত করেছে। সি পি এম কর্মীদের মধ্যে যারা বামপন্থী রাজনীতিকে আজও ভুলতে পারেননি তাঁরা নেতৃত্বের কংগ্রেস ভজনাকে মন থেকে মানতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের অনেকেই এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

সি পি এম নেতৃত্ব বোঝাতে চাইছে বিজেপিকে রুখতে হলে কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে হবে — এইটেই একমাত্র বাস্তব পথ। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোকে দলের কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা মাঝে মাঝে কংগ্রেসের 'দোদুল্যমানতা'র মৃদু সমালোচনা করছে। কিন্তু সাথে সাথে ২০ জানুয়ারি পিপলস ডেমোক্রেসিতে সি পি এম নেতা প্রকাশ কারাত পরিষ্কার বলেছেন "সি পি এম একথা মনে করে না যে, বিজেপি ও কংগ্রেস থেকে সমদূরত্ব রক্ষা করা উচিত।" অর্থাৎ, বিজেপি'র বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথী হওয়ার নীতিই তারা নিচ্ছে যা কোনভাবেই শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করতে পারে না।

সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা রাজনীতিকে যথার্থই পরাস্ত করতে হলে, এই রাজনীতির শ্রেণীগত ভিত্তিটি বুঝে নিতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিজেপি ও কংগ্রেসের রাজনীতির শ্রেণী উৎস নির্দেশ করে ৬ই ডিসেম্বর ২০০২ গণদাবীতে আমরা লিখেছিলাম —

একথাও মনে রাখা দরকার, বিজেপি এইসব বর্বর ধ্বংসকান্ড করার সাহসই পেত না, কংগ্রেসও এইসব করতে পারত না যদি এ দেশের আসল মালিকরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা না চাইত বা বাধা দিত। কারণ এই বুর্জোয়া দলগুলি পুঁজিপতিদের অর্থে-মদতে এবং স্বার্থে চলে। এই শোষক শ্রেণীই ওদের গদীতে বসায় এবং হুকুম তামিল করায়। আজ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রয়োজন দেশে ধর্মান্ধতা বাড়ুক যাতে বিজ্ঞানধর্মী চিন্তা লুপ্ত করে ফ্যাসিস্ট অন্ধ মানসিকতা গড়ে তোলা যায়; ওদের প্রয়োজন বারবার সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালানো যাতে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ-শত্রুতা জাগিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের ঐক্য ভাঙা যায়। পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদও ততদিন থাকবে। ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে শুধু বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই নয়, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে।

একথাও বুঝতে হবে যদিও আজ দেশে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ প্রধান বিপদ, কিন্তু সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদও বিপজ্জনক। যত হিন্দুত্বের জিগির বাড়বে, তত একদল মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দেবে, যত মুসলিম ঐক্যের আওয়াজ বাড়বে, তত হিন্দুত্ববাদীরা এর সুযোগ নিয়ে হিন্দু ঐক্যকে আরও জোরদার করবে। ... ধুরন্ধর সাম্প্রদায়িক নেতারা, বা শিল্পপতি-ব্যবসাদাররা কেউ দাঙ্গা করতে রাস্তায় নামে না। প্রবল সাম্প্রদায়িকতার বিষে জনগণকে আচ্ছন্ন করে, যুবশক্তির একাংশকে উন্মত্ত করে, প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং ক্রিমিনালদের কাজে লাগিয়ে ওরা বারবার এই হত্যাকান্ড ও ধ্বংসলীলা ঘটায়। ... এই সাম্প্রদায়িকতার আগুনে শুধু অসংখ্য প্রাণ, ধনসম্পদ, নারীর ইজ্জৎ পুড়ছে তাই নয়, পুঁজিবাদী শোষণ ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নানা আক্রমণ প্রতিরোধে এবং জনজীবনের নানা দাবিতে আজ যে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত জরুরি প্রয়োজন তার উদ্যোগও বারবার মার খাচ্ছে। ... তাই আজ প্রয়োজন নিজেদের মনকে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ধর্মবিশ্বাসীরা নিজ নিজ বিশ্বাসমত ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্চা করবে, কিন্তু সামাজিক জীবনে কারো পরিচয় কোন ধর্ম দিয়ে নয়। সেখানে একমাত্র পরিচয় হবে একই শোষিত অত্যাচারিত পরিবারের সদস্য হিসাবে, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা হিসাবে, একই সংগ্রামের সাথী হিসাবে।

## আলু কিনতে আইটিসি-কে ডাক

# ম্যাকিনসের সুপারিশই কার্যকর করছে বামফ্রন্ট

মাঠ থেকে আলু উঠতে না উঠতেই দাম পড়তে শুরু করেছে। বাজারে ক্রেতা নেই। গরিব চাষি দাম পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের 'কৃষক দরদী' সরকার সময় বুঝে এখন বলছে, তারা বহুজাতিক সংস্থা আই টি সি-কে আলু কেনার জন্য ডাকবে। ভাবখানা এমন যেন বৃহৎ পুঁজি কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ে নামলে চাষির দুঃখ ঘুচে যাবে। শুধু আলু নয়, ধান, পাট, সবজি, ফুল সব চাষের ক্ষেত্রেই তারা বহুজাতিক পুঁজিকে ডাকার উদ্যোগ নিচ্ছে। তারা বলছে — কৃষিপণ্যের বাজার না-থাকা, দাম পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে কৃষি অর্থনীতিকে বৃহৎ পুঁজির আওতায় আনতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের ধান, আলু, শাকসবজি উৎপাদন এখন প্রচুর বেড়েছে, কিন্তু সমস্যা হল ফসলের মরশুমে বাজারে দাম পড়ে যাচ্ছে। লাভ দূরের কথা চাষের খরচটা উঠবে কিনা তারও নিশ্চয়তা থাকছেনা। অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক সহ নানা রাজ্যে এ সমস্যা ইতিমধ্যেই তীব্র। পশ্চিমবঙ্গেও এটি দীর্ঘদিনের সমস্যা যা অতিদ্রুত মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। স্বাধীনতার পর বহু বছর কংগ্রেস শাসকরা বলত উৎপাদন বাড়ানোই সমৃদ্ধির চাবিকাঠি, উৎপাদন বাড়ালে চাষির দারিদ্র্য ঘুচবে। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় বসে ভূমি সংস্কারকে কৃষি অর্থনীতির সর্বরোগহর দাওয়াই বলে প্রচার করেছিল। তাদের এই দাবি কতটুকু সত্য তা বিচার বাদ দিলেও প্রশ্ন হচ্ছে চাষির জীবনের মূল সমস্যা তারা কতটুকু দূর করতে পেরেছে। চাষির জীবনের বহু সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে সস্তায় চাষের উপকরণ এবং ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়া। চাষের উপকরণের দাম বাড়ছে, ফলে উৎপাদনের খরচ বাড়ছে। সরকারি নীতির ফলেই চাষের উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। যেসব ফসলের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত দাম আছে, সেক্ষেত্রেও তা পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। আর বহু ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত কোন দামই নেই। সরকার নিজে ন্যায্যমূল্যে চাষির ফসল কেনার কোন ব্যবস্থা করেনি। ফড়েরা সরকার ঘোষিত দামের অনেক কমে চাষিকে ফসল বেচতে বাধ্য করে চাষিকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। এখন ফড়েদের জায়গা নিয়েছে বিশাল পুঁজির মালিকরা। কৃষি ব্যবসায়ে এখন বিপুল পরিমাণ পুঁজি খাটছে, সেই পুঁজির মালিকরাই কৃষিপণ্যের বেচাকেনার বিশাল বাণিজ্য কবজা করেছে। চাষির কাছে এরা জলের দামে পণ্য কিনে চড়া দরে বেচছে। তাদের শোষণের ফাঁস চাষির গলায় এঁটে বসেছে। কৃষিপণ্যের বাজারে ক্রেতা হিসাবে নেমে পুঁজির মালিকরা ফসলের দাম কমিয়ে দিচ্ছে, চাষি সেই কম দামেই বেচতে বাধ্য হচ্ছে। সস্তায় কেনা সেই ফসল মালিকরা বাজারে অনেক বেশি দামে বেচে মুনাফা তুলছে। চাষিদের রক্ত এরাই শুষে নিচ্ছে। এই সর্বনাশা রক্তচোষার যন্ত্রটা আরও জোরদার করতে সি পি এম নেতৃত্ব এবার কৃষিপণ্যের বাজারে ঢোকার জন্য আই টি সি-র মতো বহুজাতিক পুঁজিকে ডাকছে বলে সংবাদে প্রকাশ। বাইরে চাষি-দরদের ভড়ং দিতে তারা বলছে এতে নাকি চাষির উপকার হবে। সংবাদে এও প্রকাশ যে, সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের অফিসাররা ইতিমধ্যেই আই টি সি-র কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন।

সি পি এম নেতৃত্ব বার বার বলছে, পশ্চিমবঙ্গে 'ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি' তারা সফল করেছে, এবং এটা একটা বিরাট কৃতিত্ব। তাই যদি হয়, তবে সেই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চাষির জীবনের সমস্যা কমার বদলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সমস্যা তীব্র হল কেন? কারণ তথাকথিত ভূমিসংস্কার আসলে উৎপাদনের তুলনায় বাজার বাড়াতে পারেনি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি প্রয়োজন অনুপাতে হলে এ সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভূমিসংস্কার তা করতে পারে না। আধুনিক বীজ, সার, নিবিড় চাষের ব্যাপক প্রয়োগে বিগত দশ-বিশ বছরে কৃষিপণ্যের উৎপাদন খুব বেড়েছে। কিন্তু বাজার তদনুযায়ী বাড়েনি। ফলে এই উৎপাদনবৃদ্ধি ক্ষুদ্র চাষির কাছে অভিশাপ হিসাবেই এসেছে। এখন সি পি এম নেতৃত্ব বলছে কৃষিপণ্যের জন্য বিদেশের বাজার চাই, রপ্তানিযোগ্য গুণমানের পণ্য উৎপাদন করতে হবে, প্রক্রিয়াকরণ-বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বৃহৎ পুঁজির সাহায্য চাই। এরই রাস্তা খুঁজতে তারা ম্যাকিন্‌সেকে মুরুব্বি ধরেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা গ্রামীণ মানুষের জীবনের উন্নয়ন, চাষির দারিদ্র্য ঘোচানো, গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি — ভূমিসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত এসব বহু কপচানো বুলি এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এখন রাজ্য সরকার কৃষির 'আরও উন্নয়নের' জন্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থের পরিপোষক পরামর্শদাতা কোম্পানি ম্যাকিনসের পরামর্শ কিনছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। সেই পরামর্শের মূল কথা হল কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাকে ডেকে আনতে হবে। কীভাবে তা হবে, জমির মালিকানা কার হাতে থাকবে — এসব নিয়ে মতামতের পার্থক্য যাই থাক, আলুর ব্যবসায়ে আই টি সি-কে ডাকার মধ্য দিয়ে বাস্তবে ম্যাকিন্‌সের সুপারিশকেই কার্যকর করার পথে তাঁরা পা বাড়িয়েছে। ম্যাকিন্‌সের প্রস্তাব নিয়ে ইতিমধ্যেই বহু বিতর্ক হয়েছে। সি পি এম বহুজাতিকের কাছে চাষির স্বার্থ বলি দিচ্ছে, নীলকরদের জমানা ফিরিয়ে আনছে বলে কথা উঠছে। ফ্রন্টের মধ্যেও এ নিয়ে বিরোধ হয়েছে। তাই ম্যাকিন্‌সের নাম করলেই নানা বিতর্ক ও প্রতিবাদ উঠবে বুঝেই নাম না করেই তারা কাজ সারতে চাইছে। নতুন কায়দায় ম্যাকিনসের মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বহুজাতিক পুঁজির হাতে কৃষকদের তুলে দেওয়ার কাজটা তারা করছে।

তারা এও জানে, কৃষি অর্থনীতির উপর বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির কব্জা কায়েমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে শুনলে গরিব চাষিদের মধ্যে আশঙ্কা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দেবে। তাই তারা ফসল ওঠার মরসুমে দাম পড়ে যাওয়া এবং চাষিদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে, চাষিদের মঙ্গল করার ভেক ধরে এগোতে চাইছে। তারা বলছে, বর্তমানে যে ফড়েরা আলু কিনছে (অর্থাৎ যারা এখনই কম দামে কিনছে) তারাই আই টি সি-র হয়ে আলু কিনবে। তবে সদাশয় সরকার বলেছে, কেনবার জন্য যে বুথ হবে তাতে কম্পিউটার থাকবে এবং সর্বশেষ দর তাতে লেখা থাকবে, চাষির সে দর পছন্দ না হলে সে বেচবে না। অর্থাৎ তারা দেখাতে চাইছে, ফড়েরা ইচ্ছামত দাম ঠিক করে চাষিকে ঠকাতে পারবে না। বাজারদর কত তা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগে কম্পিউটারের মাধ্যমে চাষি জানতে পারবে। চাষি বাজারদর পাবে এটা নিশ্চিত, দরে না বনলে না বেচার স্বাধীনতাও তার থাকবে। আর কী! এর পর কৃষকের মুক্তির আর বাকি রইল কী!

তবে বেয়াড়া প্রশ্নের জায়গা আছে বৈ কি! যে কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে তা হল, ফড়েদের বদলে এখন আলুর দর ঠিক করবে আই টি সি কর্তৃপক্ষ, সেই দরই তারা কম্পিউটারের মাধ্যমে জানাবে। আই টি সি একটি বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থা, যার মূল ও একমাত্র লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা, কাজেই তারা চাইবে সর্বনিম্ন দামে কিনতে। অর্থাৎ একচেটিয়া ক্রেতা হিসাবে ক্রয়মূল্য নির্ধারণের একচেটিয়া ক্ষমতা চলে যাবে আই টি সি-র হাতে। উত্তরে সরকারপক্ষ বলতে পারে, আই টি সি বাজারছাড়া কম দর দিলে চাষি বেচবে না, ফলে তাকে দর বাড়াতে হবে।

বাজার অর্থনীতির এই স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের বচন ধনীর ক্ষেত্রে সত্য হলেও গরিবের কাছে তা পরিহাস। যার ঘরে অন্ন নেই, সুদে টাকা ধার করে যে চাষ করেছে তার ফসল না বেচার স্বাধীনতা কেবল কাগুজে অধিকার। যে চাষি অভাবী বিক্রি করতে বাজারে আসে তার দরাদরি করার ক্ষমতা থাকে না। তার ওপর মাঠ থেকে ফসল বাজারে আনার পর না বেচে আবার গাড়িভাড়া করে ঘরে ফেরত নেওয়ার ক্ষমতাও যে তাদের নেই, রাইটার্সের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে সরকারি কর্তারা কি তাও ভুলে গেছেন? নাকি প্রতারণাকে আড়াল করার এ এক কৌশলমাত্র।

আই টি সি ক্রেতা হয়ে এলে চাষিকে তপ্ত কড়াই থেকে সোজা জ্বলন্ত উনুনে পড়তে হবে। কারণ ফড়েদের রাজত্বে যতটুকু দরাদরির সুযোগ ছিল, এ হাট ও হাট ঘুরে দু'চার পয়সা দর বেশি পাওয়ার যদি বা সম্ভাবনা থাকত, এখন তাও থাকবে না। ফড়েতে ফড়েতে প্রতিযোগিতার ফলে দরের যেটুকু ফারাক থাকতে পারত এখন আই টি সি এলে তা কর্পূরের মতো উবে যাবে। সর্বত্র একই রকম কম দাম থাকবে। চাষির অসহায়তা বহুগুণ বেড়ে যাবে। 'সফল ভূমি সংস্কারের' ধাক্কায় আধমরা চাষির অন্তিম সংস্কারের যেটুকু বাকি ছিল, কৃষির বাজারে বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশের ব্যবস্থা করে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার এখন তা-ই করতে চাইছে। আসন্ন ভবিষ্যতে গরিব চাষির সামনে কেবল দুটো পথ খোলা থাকবে। হয় মরতে হবে নয়ত লড়ে বাঁচতে হবে। তেভাগার লড়াইয়ের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বঙ্গদেশের চাষি লড়াইয়ের পথই বেছে নেবে — এটাই আমাদের বিশ্বাস।

## যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ছাত্র ধর্মঘট

**বুশ-ব্লেয়ারের ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সাবেক ইউরোপ নয়, খোদ আমেরিকায়ও বিশাল বিশাল যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন গড়ে উঠছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর এতবড় আন্দোলন আর সেদেশে দেখা যায়নি। সম্প্রতি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলির এমনকি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ক্যাম্পাসগুলিতে ছাত্র সংগঠনগুলি কলেজ পত্রিকা, শিক্ষাসংক্রান্ত সম্মেলন, ই-মেল ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করে বুশের ইরাকনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিতর্ক সংগঠিত করছে। ব্যাপকতার বিচারে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিকাগোয় ক্যাম্পাস যুদ্ধবিরোধী নেটওয়ার্ক নামক সংগঠনের দ্বারা আহূত এক জাতীয় সম্মেলন, জাতীয় যুব ও ছাত্র শান্তি মোর্চার 'বোমা নয় বই' — এই দাবিতে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে একদিনের ধর্মঘট ও পুয়ের্তো রিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিন আমেরিকার র‍্যাপ, রক ও অন্যান্য সঙ্গীতগোষ্ঠীকে যুক্ত করে এক যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশ। ওয়াশিংটন লস এঞ্জেলস প্রভৃতি শহরে স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা ওয়াক আউট করে বুশের ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। দেশের সর্ববৃহৎ ক্যাম্পাসগুলির অন্যতম ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর গেইন্‌সভিলের রাস্তায় বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মিছিলে ব্যানারে ব্যানারে ঘোষিত হয়েছে আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার। 'নেতারা আমাদের দুনিয়ার চোখে হেয় করছে, অন্যদের সন্ত্রস্ত করছে', 'বোমা ফেলো না বুশকে ফেলে দাও', 'এই যুদ্ধ বুশের কীর্তি।'**

**নিউইয়র্কে মর্যাদামণ্ডিত আইভি লীগ স্কুল, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ঐ রাজ্যের ফিঙ্গার লেক অঞ্চলের ছোট মুক্তমনা আর্ট কলেজ - হোবার্ট অ্যাণ্ড উইলিয়ম স্মিথ কলেজ-এর অগণিত ছাত্রছাত্রীরা ১৫ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের রাস্তায় পাঁচ লাখ মানুষের যুদ্ধবিরোধী মিছিলে যোগ দিয়েছিল। তাদের অভিভাবকদের মধ্যে থেকে উঠে আসছে মন্তব্য ঃ "১১ সেপ্টেম্বরের পরও ক্যাম্পাসগুলিতে বিশেষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় নি। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টেছে।" ষাটের দশকের উত্তাল বিক্ষোভ ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার মাটিতে আজকের বিক্ষোভের চেহারা সেইদিনগুলিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।**

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২৮ সংখ্যা ৮

# চতুর্থশ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হল

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে, বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, অধ্যাপক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ১৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে ৪র্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা।

প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্যজোড়া দীর্ঘ গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে শুরু হয়েছিল এই পরীক্ষা, যা স্বাধীন ভারতে শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

সরকারের রক্তচক্ষু, শাসকদলের হামলা, প্রশাসনিক সার্কুলার ও শাস্তির হুমকিকে অগ্রাহ্য করে জনসমর্থন ও গণউদ্যোগে সাফল্যের সঙ্গে ১২ বছর ধরে চলার পথে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ গুণ। এবছরও শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছেন — এটা নাকি কোন পরীক্ষাই নয়, 'এ পরীক্ষা অবৈধ'।

সরকারি স্বীকৃতির পরোয়া না করে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাজের গভীর আবেগের স্বীকৃতিধন্য এই বৃত্তি পরীক্ষায় এবছর ২৭০২ টি কেন্দ্রে প্রায় ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে।

উন্নয়ন পর্ষদের সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা জানিয়েছেন — প্রায় ৩৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় বসেছে। প্রায় ৩৮ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ শিশুদের যতদূর সম্ভব ভালোভাবে শিক্ষাদান ও তার ফল যাচাইয়ের আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে সফল করেছেন। তিনি বলেন — আগামী মে মাসে ৫০০ জন বিশেষ কৃতী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

পরীক্ষার প্রথম দিন, ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্ষদের সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে ও পর্ষদের সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন এবং ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহিত করেন।

এই পরীক্ষায় ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের প্রবল উৎসাহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ একটা আন্দোলনরূপেই গড়ে উঠেছে এবং প্রমাণ করেছে তাঁরা অটোমেটিক প্রমোশন প্রথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বোধ থাকলে রাজ্য সরকারের উচিত ছিল নীতি পরিবর্তন করে পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু শিক্ষাসংহারে কৃতসঙ্কল্প বামফ্রন্ট সরকার তাদের সর্বনাশা শিক্ষানীতিই চালু রেখেছে। ফলে সরকারকে পাশ ফেল ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করার জন্য এই পরীক্ষাকে আরও ব্যাপক ও শিক্ষা আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে হবে।

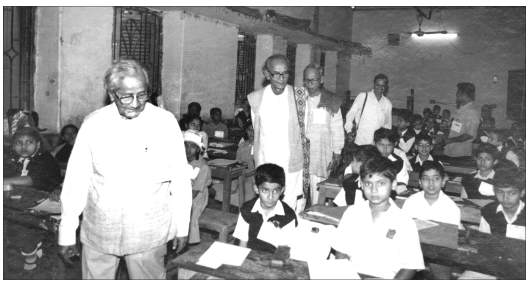

*যাদবপুর বিদ্যাপীঠে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শনে ডঃ সুশীল মুখার্জী, ডঃ রমাপ্রসাদ দে, ডঃ সুনন্দ সান্যাল ও কার্তিক সাহা*

*২৪ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুর কোর্টে অবস্থান বিক্ষোভ*

# বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর অবস্থান

বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত সদর আদালত সহ কলকাতার আলিপুর কোর্ট, সিটি সিভিল ও শিয়ালদহ কোর্টে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবস্থান হয়। সাধারণ নাগরিক সহ আইনজীবীরাও এই অবস্থানে অংশ নেন এবং বক্তব্য রাখেন। কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন কোর্টের বিচারপতির মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

**পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে চিহ্নিত চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করতে এবং সি পি আই (এম) এবং অন্যান্য মেকি বামপন্থীদের মার্কসবাদবিরোধী নির্বাচন সর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে**

**আসামের বিধ্বস্ত বামপন্থী আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করতে**

**২৬ ফেব্রুয়ারি উপনির্বাচনে**

**রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই সমর্থিত প্রার্থী**

**অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক পীযূষকান্তি দাসকে**

**জয়যুক্ত করুন**

## ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা

| কেন্দ্র | জেলা | প্রার্থী |
|---|---|---|
| ৬নং আগরতলা | পশ্চিম ত্রিপুরা | শিবানী ভৌমিক |
| ১৪নং বাধারঘাট | পশ্চিম ত্রিপুরা | সুব্রত চক্রবর্তী |
| ৫৬নং ধর্মনগর | উত্তর ত্রিপুরা | সঞ্জয় চৌধুরী |
| ৩২নং রাধাকিশোরপুর | দক্ষিণ ত্রিপুরা | শেফালি চৌধুরী |

## আন্দোলনের ফলে

# রঘুনাথপুর শহরে আবার জল দেওয়া শুরু হল

খরাপীড়িত পুরুলিয়া জেলায় পানীয় জলের কষ্ট সকলেরই জানা। জেলার রঘুনাথপুর শহর এবং সংলগ্ন অন্যান্য গ্রামাঞ্চল গ্রীষ্মে প্রবল জলকষ্টের মধ্যে পড়ে। ২০০০ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু খুব ঘটা করে লক্ষ্মণপুর জলপ্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন, কথা দিয়েছিলেন এই এলাকার মানুষের আর জলকষ্ট থাকবেনা। দীর্ঘদিন পর জল দেওয়া শুরু হল, এলাকার মানুষের মুখে একটু হাসি ফুটল, আর সেই হাসি ফুটতেই বন্ধ করে দেওয়া হল জল, এক ফতোয়া জারি করে। ফতোয়াটি হচ্ছে ঃ 'বিদ্যুতের টাকা দেয়নি সরকার তাই জল দেওয়া বন্ধ।'

এস ইউ সি আই রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে লাগাতার ডেপুটেশন, অবস্থান, অবরোধ, প্রভৃতির চাপে এবং মানুষের তীব্র রোষে বাধ্য হয়েই সরকার শেষপর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মিটিয়েছে এবং প্রকল্প আবার চালু হয়েছে। রঘুনাথপুর শহরের মানুষের ব্যাপক সমর্থনেই এস ইউ সি আই-এর এই লড়াই সফল হয়েছে।

# মার্কিনী যুদ্ধ চক্রান্তের প্রতিবাদে

*১৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী দিবসে মার্কিনী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আসামের গৌহাটিতে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ*

*১৫ ফেব্রুয়ারি কর্নাটকের বেলারিতে এস ইউ সি আই-এর যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ*

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net